দলের চেয়ে দেশ বড়

প্রশ্নের মুখে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব

নির্বাচন হয়ে গেছে ১ অক্টোবর। এর মধ্যে পৃথিবী এগিয়ে গেছে অনেক দূর। অথচ পুরো দেশ আছে সেই দিনেই। এখনও চলছে জয় পরাজয়ের হিসাব নিকাশ। আর আওয়ামী লীগ আটকে আছে কারচুপির অভিযোগ নিয়ে। দিক নির্দেশনাহীন আন্দোলন করার ডাক দিয়েছে হাই কমান্ড। আবার একই সঙ্গে দেশ ত্যাগ করেছেন কয়েকজন শীর্ষ নেতা। নতুন নির্বাচনের দাবী যে অযৌক্তিক তা বুঝতে শুরু করেছে অন্ধ সমর্থক কর্মীরাও। তারা অভিযোগ তুলছে পাঁচ বছরের শাসনের সময়ের প্রতাপশালী নেতা, মন্ত্রীদের নিয়ে। এরই মধ্যে অসহযোগ আন্দোলনের মত হঠকারী সিদ্ধান্ত দলকে এবং দলের নেতৃত্বকে কোন পথে নেবে ... লিখেছেন **মোহসিউল আদনান**

'হুন্ডা, গুন্ডা, মাস্তান এই নিয়েই পূর্বের নির্বাচন হয়েছে। এখনও পর্যন্ত অবাধ নির্বাচন দেখছি।' এই ছিল শেখ হাসিনার প্রতিক্রিয়া নির্বাচনের দিন ভোট দেবার সময়ে। কোথাও তিনি নীল বা অন্য কোনো রঙের নকশা দেখেননি, বলেননি। তার অনুসারী ছিলেন দলীয় অন্য নেতা-কর্মীরাও। ভোট গণনার আগ পর্যন্ত কোনো প্রার্থী, পোলিং এজেন্ট কেউই কারচুপির কোনো অভিযোগ আনেননি। অভিযোগ শুরু হয় ফল ঘোষণার পরে। ২ অক্টোবরে সাংবাদিক সম্মেলনের শুরুতেই শেখ হাসিনা বলেন, 'সূক্ষ্ম নয় স্থূল কারচুপি হয়েছে।' তার এই দাবির পক্ষে সেদিন থেকে আজ ৮ অক্টোবর পর্যন্ত আওয়ামী লীগ কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ দিতে পারেনি। দলীয় নেত্রী বলেছেন, ব্যালট বাক্স আগের দিন রাতেই ভরে রাখা হয়েছিল ... ভোট গণনার সময়ও কারচুপি হয়েছে...। এরকম হলে তাদের পোলিং এজেন্টরা কেন তখন অভিযোগ করেননি সে বিষয়ে তার কোনো বক্তব্য নেই। আর কোন আসনে এরকম ঘটনা ঘটেছে, কি প্রক্রিয়ায় ঘটেছে তার কোনো ব্যাখ্যা আওয়ামী লীগ এখনও দেয়নি। হয়ত দিতে পারছে না। আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য নওগাঁ-২ আসনে বিজয়ী প্রার্থী আব্দুল জলিলও সুর মিলিয়েছেন নেত্রীর সঙ্গে। আট-দশ দিনের মধ্যেই প্রমাণ হাজির করা হবে বলে তিনি

> 'জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে এই নির্বাচন... আমরাও মানতে পারি না'— আওয়ামী লীগ নেত্রীর এই বক্তব্যের পক্ষে কোথাও কোনো জনমত, দলীয় মত তো নেই-ই বরং সরাসরি বিপক্ষ মতই বেশি প্রচারিত হচ্ছে। নিজ দলের হাতে গোনা কয়েকজন নেতা ছাড়া বাকি সবাই গোপনে বিপক্ষে রয়েছেন আন্দোলন প্রসঙ্গে

আশ্বাস দিয়েছেন। এত দেরিতে কেন প্রমাণ দেয়া হবে তা অবশ্য কোনো সুস্থ মানুষেরই বোধগম্য নয়। তবে এটুকু বোধগম্য ছিল, নির্বাচনে পরাজয়ের পর পরাজিত দল কারচুপির অভিযোগ আনবে। সাপ্তাহিক ২০০০-এর নির্বাচনপূর্ব সংখ্যায় প্রচ্ছদ কাহিনী ছিল 'এখন অপেক্ষা : কে করবেন কারচুপির অভিযোগ'। দুই নেত্রীর কল্যাণে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের বাস্তবতা এমনই। এরা মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও কেউই পরাজয়ের বাস্তবতা মেনে নিতে চান না। একানব্বই-এ শেখ হাসিনা বলেছিলেন 'সূক্ষ্ম কারচুপি', ছিয়ানব্বইতে খালেদা জিয়া 'পুকুর চুরি' হয়েছে বলে অভিযোগ এনেছিলেন। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী এবার যোগ করেছেন নতুন বিশেষণ 'স্থূল কারচুপি'। এই অভিযোগ করেই ক্ষান্ত হননি শেখ হাসিনা। দলের সিনিয়র নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের পরে দাবি জানিয়েছেন নতুন নির্বাচনের। অন্যথায় বিক্ষোভ, অবরোধ, অসহযোগ আন্দোলন করার কথাও বলেছেন। কল্পিতভাবে টেনে এনেছেন জনগণকে। 'জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে এই নির্বাচন... আমরাও মানতে পারি না'– আওয়ামী লীগ নেত্রীর এই বক্তব্যের পক্ষে কোথাও কোনো জনমত, দলীয় মত তো নেই-ই বরং সরাসরি বিপক্ষ মতই বেশি প্রচারিত হচ্ছে। নিজ দলের হাতে গোনা কয়েকজন নেতা ছাড়া বাকি সবাই গোপনে বিপক্ষে রয়েছেন আন্দোলন প্রসঙ্গে। যারা পক্ষে রয়েছেন তাদের রয়েছে যুক্তিসঙ্গত কারণ। নির্বাচনের ফলাফল বলে দিচ্ছে তাদের প্রকৃত অবস্থা। এখন দলের মধ্যেও তারা হয়ে পড়বেন কোণঠাসা, যদি সুস্থ রাজনীতির চর্চা হয়। তাই বিকল্প পথে এগিয়ে যাবার বুদ্ধি তারা দেবেন এ নিয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। আর অনেকে দীর্ঘদিন তোষামোদ করতে করতে মেরুদন্ড হারিয়ে ফেলেছেন। বুঝলেও তাদের বলার ক্ষমতা নেই এই সিদ্ধান্ত সঠিক নয়। প্রতিবাদ করেছেন জেলা প্রতিনিধিরা। কেননা তারা জানেন, সারা দেশে আন্দোলন ছড়িয়ে দেবার নামে তাদের ওপর দায়িত্ব এসে পড়বে। যে আন্দোলনের কোনো যৌক্তিকতা নেই। এমন আন্দোলনের দায়িত্ব নেয়া যে শখ করে বিপর্যয় ডেকে আনা তা মাঠ পর্যায়ের নেতারা খুব ভালোভাবেই জানেন। অথচ তাদের কথা শোনার সময় এখনও শেখ হাসিনার হয় না। ব্যস্ততার দোহাই দিয়ে চামচা পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি সমাবেশ ছাড়তে চাইলে মৌলভীবাজার জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সৈয়দ মোহসীন আলী বলেন, 'নেত্রী আত্মীয়, তোষামোদকারী আর চামচাদের কথা অনেক শুনেছেন, এবার আমাদের কথা শুনুন। ওরা আপনাকে শেষ করে দিয়েছে।' আঞ্চলিক নেতাদের বিক্ষুব্ধ বক্তব্য শেখ হাসিনার কান পর্যন্ত পৌঁছালেও তিনি তার আন্দোলনের সিদ্ধান্তে অটল রয়েছেন। প্রশ্ন উঠেছে আদৌ এ আন্দোলন হবে কী হবে না তা নিয়ে। আন্দোলন শুরু হলে কার কী লাভ হবে তা নিয়েও কথা উঠেছে। অসহযোগ আন্দোলন বলতে শেখ হাসিনা কী বুঝেছেন আর কী বোঝাতে চাইছেন সেটাও পরিষ্কার নয়। এক সময় এই অসহযোগ আন্দোলন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। সফল হয়েছিলেন। সামরিক স্বৈরাচার এরশাদের বিরুদ্ধে হাসিনা-খালেদা একদা অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। তখন এরশাদ বিরোধী আন্দোলন ছিল তুঙ্গে কিন্তু সফল হয়নি সেই আন্দোলন। আর একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা সরকারের বিরুদ্ধে আর যাই হোক অসহযোগ আন্দোলন সফল হবে না। একথা বোঝার জন্যে খুব বেশি বুদ্ধি থাকার প্রয়োজন হয় না। অদূরদর্শী এবং স্থূলবুদ্ধির রাজনৈতিক নেতৃত্বের পক্ষেই এমন সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব। একারণে শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব ও ভবিষ্যৎ রাজনীতিও প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয় এখন।

সাংসদ হিসেবে তোফায়েল আহমেদের কোনো বিকল্প নেই আওয়ামী লীগে। গোপালগঞ্জে শেখ হাসিনার আসন ছেড়ে দিয়ে তোফায়েল আহমেদকে জিতিয়ে আনতে হবে আওয়ামী লীগের

> শেখ হাসিনাকে বুঝতে হবে জয় বিএনপি'র হয়নি। আওয়ামী লীগের পরাজয় খালেদা জিয়াকে বিজয় এনে দিয়েছে। আওয়ামী রাজনীতিতে সহনশীলতার অভাব– এই বদনাম ঘোচাতে হবে দলের শীর্ষ নেতাদের। শেখ হাসিনার বক্তব্য-বিবৃতিও সমালোচনার ঊর্ধ্বে নেই এখন

আন্দোলন : কেন সফল হবে না

আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব আন্দোলনের যে ঘোষণা দিয়েছে সেখানে রয়েছে স্পষ্ট স্ববিরোধিতা। একদিকে বলছে 'নির্বাচন মানি না, পুনর্নির্বাচন চাই' অন্যদিকে স্থগিত আসনের নির্বাচনে অংশ নিয়েছে শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ। দলীয় হাইকমান্ডের এই স্ববিরোধী সিদ্ধান্ত কর্মী-সমর্থকদের মাঝেও ছড়িয়েছে। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেছেন বক্তব্য দিতে সুযোগ পাওয়া চট্টগ্রামের আক্তারুজ্জামান বাবু।

তারপরও নির্বাচনের ফলাফলে বিপর্যস্ত আওয়ামী লীগ নেতা, কর্মী, সমর্থকদের মনোবল চাঙ্গা রাখার জন্য এ সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে। অথবা থাকতে পারে অন্য কোনো সুগভীর পরিকল্পনা। সেরকম কিছু থাকলে তা বাস্তবায়নের কোনো সুযোগ নেই। কেননা দুই-তৃতীয়াংশের অধিক আসন পাওয়া কোনো জোটের বিরুদ্ধে কোনো পরিকল্পনায় সাহায্য করার মতো সুযোগসন্ধানী কাউকে খুঁজে পাওয়া সত্যিই দুষ্কর।

অন্ধ সমর্থক, কর্মীদের বিধ্বস্ত মানসিক অবস্থা কাটিয়ে ওঠার কৌশল হিসেবে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব এই আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। নির্বাচনকালীন কর্মব্যস্ত সময়ের পর ক্লান্ত, অবসাদগ্রস্ত কর্মীদের সবল রাখার এই কৌশল অবশ্য নতুন নয়। তাই দুই-তিন দিনের মধ্যেই তারা বুঝে গেছে আন্দোলনের কোনো যৌক্তিক ইস্যু নেই এবং দাবি পূরণের কোনো সম্ভাবনাও নেই।

‘সাংবিধানিক সমস্যা ছিল এ দাবি তোলার। এছাড়া ভোট কারচুপির বিষয়টি জনগণের কাছে স্পষ্ট হতো না’

আমির হোসেন আমু
প্রেসিডিয়াম সদস্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

সাপ্তাহিক ২০০০ : আপনাদের এ নির্বাচনে এ পরাজয়ের কারণ কি বলে মনে করেন?

আমির হোসেন আমু : এ নির্বাচনে আমাদের কারচুপি করে পরাজিত করা হয়েছে। সন্ত্রাস করে আমাদের প্রতিরোধ করেছে। কারচুপি ও সন্ত্রাসের সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকার নীরব থেকেছে। নীল নকশা করে আমাদের হারিয়ে দেয়া হয়েছে।

২০০০ : আপনাদের আমলের সন্ত্রাস ও ব্যর্থতা কি এর জন্য দায়ী নয়?

আমির হোসেন আমু : আমাদের আমলে এদেশে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। তিন বছর বাম্পার ফলন হয়েছে। দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল ছিল। দেশের অবকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। জনগণ আমাদের সফলতার সঙ্গেই আছে ও ছিল। ভোট জালিয়াতি ও কারচুপি করে তাদের রায় ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। তবে বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ঘটেছে এ কথা ঠিক। নীল নকশার নির্বাচনে আমাদের হারানো হয়েছে।

২০০০ : আপনারা কি আগেই বুঝতে পারেননি এমন একটি নির্বাচন হতে যাচ্ছে?

আমির হোসেন আমু : হ্যাঁ আমরা আগেই বুঝতে পেরেছিলাম, কারচুপি ও নীল নকশার একটি নির্বাচন হতে যাচ্ছে। আমরা এ কথা বারবার বলেছি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছি।

২০০০ : তাহলে নির্বাচনে অংশ নিলেন কেন?

আমির হোসেন আমু : আমরা জানতাম জনগণ আমাদের সঙ্গেই আছে। জনগণকে সঙ্গে নিয়েই আমরা নীল নকশা প্রতিরোধ করবো। আমরা যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করতাম তাহলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এ নীল নকশা জনগণের সামনে ধরা পড়তো না। কারচুপি ও ভোট জালিয়াতি করে যে চারদলীয় জোট জিতেছে জনগণের কাছে তা এখন স্পষ্ট।

২০০০ : এখন আপনারা রাষ্ট্রপতির অধীনে নির্বাচন চাচ্ছেন। নির্বাচনের আগে এ দাবি তুললেন না কেন?

আমির হোসেন আমু : সাংবিধানিক সমস্যা ছিল এ দাবি তোলার। এছাড়া ভোট কারচুপির বিষয়টি জনগণের কাছে স্পষ্ট হতো না।

২০০০ : আপনারা বার বার কারচুপির অভিযোগ করছেন। আসলে কি ধরনের কারচুপি হয়েছে?

আমির হোসেন আমু : তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাদের পক্ষে কাজ করেছে। তারা চারদলীয় জোটের সরকারের মত আওয়ামী লীগের সঙ্গে আচরণ করেছে। ক্ষমতায় এসে সিভিল ক্যু করেছে। প্রশাসন তাদের পক্ষে কাজ করেছে। ভুয়া ব্যালট পেপার এনে সিল মেরে বাক্স ভরা হয়েছে। আমার আসনে আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীদের ওপর জুলুম চালানো হয়েছে। তাদের ওপর সন্ত্রাস চালানো হয়েছে। প্রশাসনের কাছ থেকে কোনো প্রতিকার পায়নি।

২০০০ : দলীয় সভানেত্রী সংসদে না যাবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। সংসদ নির্বাচন বাতিল না করলে অসহযোগ কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। গণতন্ত্রের জন্য কি এ সিদ্ধান্ত আত্মঘাতী হচ্ছে না?

আমির হোসেন আমু : গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রার মূল সোপান হচ্ছে নির্বাচন। আর নির্বাচনই যদি অবাধ ও নিরপেক্ষ না হয়, তাহলে মেনে নেয়া যায় না। নির্বাচনের ফলাফলে জনগণের রায়ের প্রতিফলন হয়নি।

২০০০ : আন্দোলনে আপনারা কি সফল হবেন?

আমির হোসেন আমু : আওয়ামী লীগ রাজপথে দীর্ঘদিনের আন্দোলন করা দল। সময় বলে দেবে আমরা সফল হবো কি না।

জয়ন্ত আচার্য

প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেরাও বিষয়টি অনুধাবন করতে পারছেন। বুঝতে পারছেন তারা কোনো কারণ ছাড়াই ব্যবহৃত হতে যাচ্ছেন। আন্দোলনের নামে তাদের মাঠে নামিয়ে পুলিশি নির্যাতনের পথে এগিয়ে দেবে নেতারা। তারপর তাদের ওপর অত্যাচারের প্রচারণায় নেমে আন্দোলনকে বেগবান করার কৌশল নেবে হাইকমান্ড। এ কারণে কর্মী, পাতি নেতারা আরো ক্ষুব্ধ। ক্ষোভের সাথেই তারা পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ করছেন ঘরোয়া আলোচনায়। বেরিয়ে পড়ছে ৫ বছর ক্ষমতায় থাকাকালীন আওয়ামী মন্ত্রী-নেতাদের সন্ত্রাস, দুর্নীতির খবর এবং একই সঙ্গে কর্মীদের অবহেলার কথা। কোথাও কোথাও শেষ সময়ের ভাগাভাগির বিষয়টি নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে। ছাত্রলীগের একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেছেন, ‘আন্দোলনে গিয়ে আমরা লাশ হবো, আর সেই লাশ নিয়ে রাজনীতি হবে এমন দিন চলে গেছে। মোহাম্মদ নাসিম, হাসানাত আব্দুল্লাহ, মোফাজ্জল হোসেন মায়া চৌধুরী এরা এখন কোথায়? আন্দোলন করলে জয়, সাদিক, আসিক আব্দুল্লাহ, দীপু চৌধুরী করবে। পাঁচ বছর ওরা মজা করেছে। এখন তো কাউকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।’ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন সভা-সমাবেশেও এসব বক্তব্য উচ্চারিত হচ্ছে। দোর্দন্ড প্রতাপশালী মোফাজ্জল হোসেন মায়া দুই দিন কর্মী-সমর্থকদের তোপের মুখে পড়েছেন। তাকে গালিগালাজ করতেও কেউ ছাড়েননি। সূত্রাপুরে জোড়া খুনের প্রধান আসামি সুমনের মা শেখ হাসিনার বান্ধবী মহিলা আওয়ামী লীগের ওয়ার্ড সভাপতি নজিবুন আহমেদ সভাস্থল ছাড়তে বাধ্য হন দলীয় লোকদের ক্ষোভের কারণে। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন শেখ হাসিনার এপিএস এবং অত্যন্ত আস্থাভাজন বাহাউদ্দিন নাসিম, প্রতাপশালী লিয়াজোঁ অফিসার বজলুর রহমানকে ধাওয়া দেয় তাদেরই দলের লোকজন। এছাড়া জেলার নেতারা সাবেক মন্ত্রীদের বিভিন্ন কর্মকান্ডের সমালোচনা করছেন নেত্রীর কাছে। এই অবস্থা থেকেই বোঝা যাচ্ছে দলের নেতাদের সাথে কর্মী-সমর্থকদের বিরাট দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে। এই দূরত্ব রেখেই আন্দোলনে নামলে কাউকে মাঠে পাওয়া

> সেনাবাহিনী আমাদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ করেছে। আমরা এমনও অভিযোগ পাচ্ছি সেনাবাহিনী কারচুপিতে সহযোগিতা করেছে। সিলও মেরেছে। অথচ দলীয়ভাবে এগুলো বলতে পারছি না। বিষয়টি খুবই সেনসেটিভ।
>
> *নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক নেতা*

যাবে না।

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর পরই আমেরিকা, ভারত, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, দেশী বিদেশী পর্যবেক্ষক সবাই যখন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের কথা বলছেন তখন শেখ হাসিনার অহেতুক অভিযোগ আওয়ামী লীগকে পিছিয়ে দিয়েছে অনেকখানি। মার্কিন সরকার ঘোষণা দিয়ে সরাসরি বলেছে তারা ফলাফল মেনে নিয়েছেন। আওয়ামী লীগকে ফলাফল মেনে নিতে বলেছেন কয়েকদিন আগে সফরে আসা সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টার। তিনি শেখ হাসিনাকে 'কথার বরখেলাপ' না করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। শুধু জিমি কার্টারই নন, প্রত্যেকটি বিদেশী রাষ্ট্রদূত, দেশের সচেতন মানুষ আন্দোলনের এই ঘোষণায় বিরক্ত হয়েছেন। তাদের এই বিরক্তি প্রকাশিত হচ্ছে পত্রিকায়। এজন্য অন্ধ নেতা, কর্মী, সমর্থকদের অনেকেরই অন্ধত্ব কাটতে শুরু হয়েছে। তাদের অনেকেই বুঝতে পারছেন আন্দোলনের অযৌক্তিক দাবিতে নেত্রী বড়ই একলা।

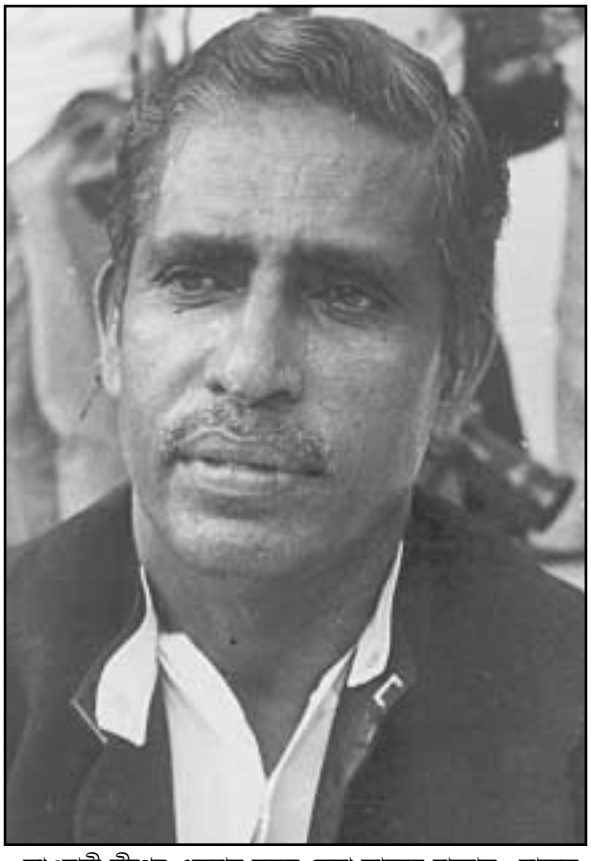

আওয়ামী লীগের একমাত্র সফল নেতা আবদুর রাজ্জাক। সাবেক পানি সম্পদ মন্ত্রী দুটি আসনে দাঁড়িয়ে দুটিতেই বিজয়ী হয়েছেন

দেশের মধ্যে আওয়ামী লীগকে সবচেয়ে চাপের মুখে পড়তে হচ্ছে ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর জন্য। এফবিসিসিআই থেকে শুরু করে ঢাকা চেম্বার পর্যন্ত প্রত্যেকটি শীর্ষস্থানীয় সংগঠন যৌক্তিক কারণেই অবরোধ, অসহযোগসহ বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক রাজনীতির বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। রাজনীতির নিয়ন্ত্রক ব্যবসায়ী শ্রেণীর এই অবস্থান আওয়ামী লীগ নেতৃত্বকে মানতে হবে তা বোঝে অনেক পাতি নেতা। আওয়ামী লীগ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যবসায়ীও একই কারণে এসব কর্মসূচির বিরুদ্ধে। যেসব সমর্থক অন্যান্য পেশার সাথে জড়িত তারাও দেশের স্বার্থে দলীয় নেত্রীর এই ঘোষণায় একাত্মতা প্রকাশ করতে পারছেন না। কেননা এরকম রাজনীতি মানেই সাধারণ মানুষের হয়রানি। এবং এই সাধারণ মানুষের মধ্যে আওয়ামী লীগের ভোটারও রয়েছে। একটি মেডিকেল কলেজের আওয়ামী লীগের অন্ধ সমর্থক একজন সহযোগী অধ্যাপক বলেন, 'নির্বাচনের ফলাফল না মেনে আন্দোলনের এই ডাক আমি সমর্থন করি না। আমার চেম্বার বন্ধ থাকবে। অথচ লোকজনকে বেতন দিতে হবে ঠিকই। আয় থাকবে না অথচ ব্যয় থাকবে। এভাবে তো জীবন চলতে পারবে না।' এটাই হচ্ছে পেশাজীবীদের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। সেখানেও আন্দোলনের সপক্ষে কোনো সমর্থন নেই।

> **পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকার সময়ে শেখ হাসিনা বার বার বলেছেন, 'সংসদই সকল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। ...আমি বিরোধী দলে গেলে হরতাল দেব না।' তিনি এ বিষয়ে বিস্মৃত হলেও জনগণ মনে রেখেছে**

সমর্থন আদায়ের জন্য আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব এখন পর্যন্ত যেমন কোনো যৌক্তিক কারণ দিতে অসফল হয়েছেন, তেমনি ব্যর্থ হয়েছেন সঠিক দিক-নির্দেশনা দিতে। প্রথমে তো নেতা-কর্মীরা দ্বিধান্বিত ছিল আবার নির্বাচনের দাবী কে পূরণ করবে বা কার করার ক্ষমতা আছে। একদিন পরে তোফায়েল আহমেদ বলেছেন তাদের দাবি রাষ্ট্রপতির কাছে। হাস্যকর দাবি রাষ্ট্রপতির কাছে প্রত্যাখ্যাত হবার পরে জনগণের কাছে যাবেন বলে শেখ হাসিনা ঘোষণা দিলেও এখনও আছেন এসএসএফ পরিবেষ্টিত অবস্থায় সুধা সদনে। দলীয় নেত্রী তার অবস্থানে এবং বাসস্থানে অটল থাকলেও দলের অনেক শীর্ষস্থানীয় নেতা দেশ ত্যাগ করেছেন অনেকটা গোপনে। সাবেক চীফ হুইপ হাসানাত আব্দুল্লাহ দুই পুত্র সাদিক ও আশিক আব্দুল্লাহ সহ সাবেক পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মহিউদ্দীন খান আলমগীর, নারায়ণগঞ্জের গডফাদার শামীম ওসমান সীমানা পার করেছেন। যারা দেশে আছেন তারা পাঁচ বছরের অভ্যস্ত আয়েশি জীবন ছেড়ে হঠাৎ রাজপথে নামতে পারবেন না। অতি মাত্রায় দুর্নীতিগ্রস্ত আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের মানসিক অবস্থা আন্দোলন চালানোর পর্যায়ে নেই। তাদের নেতৃত্ব মানতে চাইবে না কর্মীরা। কেননা কর্মীরা ভালোভাবেই বোঝে এই ভরাডুবির নেপথ্যে আছে এই নেতারা। দলীয় নেতাদের এই অবস্থায় কিভাবে আন্দোলন চলবে তা ভেবে দেখতে হবে শেখ হাসিনাকে।

ছাত্রলীগ, যুবলীগ বা আওয়ামী লীগের প্রথম সারির নেতা যারা, যাদের কথায় কর্মীদের আন্দোলনে নামার কথা, তাদের বিষয়ে কর্মীদের রয়েছে প্রবল সন্দেহ। কারণ এই নেতারা গত পাঁচ বছর ক্ষমতার কাছাকাছি থেকে সুবিধা নিয়েছেন। কোটিপতি হয়েছেন অনেকেই। তাই এদের কথায় নেতারা মাঠে নামবে না। আর এই নেতারাও আন্দোলনে নেমে পুলিশি নির্যাতন আর মামলায় জড়াতে চাইবে না। একমাত্র নেতৃত্বে ব্যাপক রদবদল হলেই কর্মীরা হয়ত আন্দোলনে আসার কথা চিন্তা করবে। আর নেতৃত্ব বদলের প্রসঙ্গ এলে সেই আলোচনায় চলে আসবে শেখ হাসিনার নামও। নেতৃত্ব নিয়ে যাতে কোনো প্রশ্ন না আসে সেই কারণে শেখ হাসিনা দিয়েছেন আন্দোলনের ডাক। আন্দোলন সফল না হলেও 'পদে' টিকে থাকাটাই প্রধান।

আন্দোলনকে অসফল করার জন্য বিএনপি সরকারও বসে থাকবে না। বিপুল জনসমর্থনের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য জনগণ আন্দোলন দমনের জন্য তাদের পদক্ষেপ নিয়ে খুব বেশি সমালোচনা করবে না। বিএনপি এক্ষেত্রে হয়ত আওয়ামী লীগ সরকারের পথই অনুসরণ করবে। রাজপথ দখলে রাখার সুযোগ নেবে বিএনপি। পুলিশ দিয়ে ঘিরে রাখবে আওয়ামী লীগের মিছিল, সমাবেশ। আর আওয়ামী লীগের তৈরি জননিরাপত্তা আইন তো আছেই। আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের নামে দুর্নীতির মামলা শুরু হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি। আয়েশি নেতারা মামলা আর হামলা থেকে নিজেদের রক্ষার জন্য হয়ত

হাসানাত আব্দুল্লাহর পথ বেছে নেবেন। সেখানে আন্দোলন কিভাবে হবে?

আন্দোলন করতে চাইলেও একটু সময় নেয়া প্রয়োজন ছিল আওয়ামী লীগের। এক দু'দিন সময় নিয়েই আন্দোলনের ইস্যু পেয়ে যেত আওয়ামী লীগ। বাস টার্মিনাল থেকে এমপি হোস্টেল পর্যন্ত সবই দখল করতে শুরু করেছে বিএনপি। কিন্তু এই বাস্তব ইস্যুতে আওয়ামী লীগ আন্দোলনের ডাক দিতে পারছে না। কারণ পূর্বেই অবাস্তব কর্মসূচি ঘোষণা করে রেখেছে। আন্তর্জাতিক ও দেশী প্রেসার গ্রুপের চাপে সংসদে যেতেই হবে এটা শেখ হাসিনা বুঝতে পেরেছেন। এখন খুঁজছেন সম্মানজনকভাবে ফেরার উপায়। হয়ত কোনো একটা উপায় বেরও করে ফেলবেন। কিন্তু 'নির্বাচনের ফলাফল মানি না। নতুন নির্বাচন চাই' তার এই অযৌক্তিক দাবি দলকে এবং দলের নেতৃত্ব কোন হাস্যকর পর্যায়ে নেমে আনিয়েছে তা কী তিনি ভেবে দেখেছেন? নির্বাচনে বিজয়ের বিষয়ে তিনি এতটা নিশ্চিত ছিলেন কীভাবে?

'জয়ী আসনে কারচুপি প্রতিরোধ করতে পেরেছি'

সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত

প্রেসিডিয়াম সদস্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

সাপ্তাহিক ২০০০ : নির্বাচনে আপনাদের পরাজয়ের কারণ কি?

সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত : নির্বাচনে আমাদের পরিকল্পিতভাবে হারানো হয়েছে। ব্যাপক কারচুপি ও সন্ত্রাস হয়েছে।

২০০০ : কারচুপি হলে আপনি তাহলে কি করে জয়ী হলেন?

সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত : আমি একটি আসনে জিতেছি। আর একটি আসনে হেরেছি। জয়ী আসনে আমি কারচুপি প্রতিরোধ করতে পেরেছি। অপর আসনে পারিনি। একজনের পক্ষে তো দুটো নির্বাচনী আসনে কারচুপি ঠেকানো সম্ভব নয়।

২০০০ : কারচুপির কি কোনো প্রমাণ আছে?

সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত : কারচুপি তো নানাভাবে হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার এসেই আমাদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। সিভিল ক্যু করেছে। এটাও এক ধরনের কারচুপি। সন্ত্রাস ও ভুয়া ব্যালট পেপার তো আছেই।

২০০০ : আপনাদের এ ব্যর্থতার জন্য কি নেতৃত্বের পরিবর্তন প্রয়োজন?

সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত : আমরা পরাজিত হইনি। আমাদের জোর করে পরাজিত করানো হয়েছে। নেতৃত্বের পরিবর্তনের এখন প্রয়োজন নেই।

২০০০ : রাজপথের আন্দোলনে কি আপনারা সফল হবেন?

সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত : রাজপথের আন্দোলনে সফল হবো কি না, তা তো সময় বলে দেবে।

বদরুদ্দোজা বাবু

তথ্য বিভ্রান্তি

নির্বাচনের মাস ছয়েক আগে একটি গোয়েন্দা সংস্থার একজন কর্মকর্তার দায়িত্ব পড়ল তথ্যানুসন্ধান করে জানানো ঢাকা-১০ আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ডা. ইকবালের অবস্থা কেমন? তিনি খোঁজ-খবর নিয়ে জানালেন সুবিধাজনক অবস্থানে ইকবাল নেই। সঙ্গে সঙ্গে সেই কর্মকর্তার সাথে জাতীয়তাবাদীদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ এনে তাকে বদলি করে দেয়া হয়। এরপর কোনো গোয়েন্দা কর্মকর্তার কাছে জানতে চাইলে তারা সব সময়ই রিপোর্ট দিত আওয়ামী লীগের প্রার্থীর অবস্থান খুব ভালো। এভাবে একজন মকবুল, একজন ইকবাল, একজন সালমান বা নূর আলী হয়ে উঠলেন 'মীথ'। সিরাজগঞ্জে মোহাম্মদ নাসিম, ভোলায় তোফায়েল আহমেদ, বরিশালে হাসানাত আবদুল্লাহ সম্পর্কে একই তথ্য দেয়া হয় দলীয় হাইকমান্ডকে। এভাবে বিভ্রান্তিকর তথ্যে ডুবে ছিলেন আওয়ামী লীগ নেত্রী। তথ্যের দিক দিয়ে আওয়ামী লীগকে সবচেয়ে বিভ্রান্ত করে তার পোষ্য বুদ্ধিজীবীরা। চার জোটের বিরুদ্ধে তাদের আন্ডার এস্টিমেশন দলকে আরো অহঙ্কারী করে তোলে। এই বুদ্ধিজীবীরা কখনোই শেখ হাসিনাকে সুপরামর্শ দেননি। বরং শেখ হাসিনার অযৌক্তিক সিদ্ধান্তের পক্ষে অবস্থান নিয়ে তোষামোদ করে লিখেছেন। শেখ হাসিনাকে গণভবন বরাদ্দ দেয়ার পক্ষেও লিখে কলম ফাটিয়েছেন তারা। ইকবালের মিছিলে গুলিবর্ষণের ঘটনা ইকবাল নিজে স্বীকার করলেও একজন পোষ্য বুদ্ধিজীবী বলেছেন, ক্যামেরা ট্রিকসের ফসল এই ছবি। এরা কখনোই আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের সন্ত্রাস ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে লেখেননি। এভাবে তারা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বকে জনগণের কাছ থেকে সরিয়ে রেখেছিলেন। নেতৃত্বের ব্যর্থতা এখানেও। নির্বাচনে এই পরাজয়ের পরও সেই বুদ্ধিজীবীদের কলম থেমে নেই। তাদের অবস্থা আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের মতই। এমনটাই হওয়া স্বাভাবিক। কেননা তারা নিজেরাও জনবিচ্ছিন্ন। কেউ কেউ আবার দেশবিচ্ছিন্ন।

> ২ অক্টোবরে সাংবাদিক সম্মেলনের শুরুতেই শেখ হাসিনা বলেন, 'সূক্ষ্ম নয় স্থূল কারচুপি হয়েছে।' তার এই দাবির পক্ষে সেদিন থেকে আজ ৮ অক্টোবর পর্যন্ত আওয়ামী লীগ কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ দিতে পারেনি

এসব তোষামোদকারী বুদ্ধিজীবীদের ভিড় ঠেলে কেউ সৎ পরামর্শ দিলে তাকে ভর্ৎসনা করা হতো। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান গণভবনের বিষয়ে শেখ হাসিনাকে প্রথমাবস্থায় নিষেধ করলেও তার কথা তখন শোনা হয়নি। পরে ঠিকই তিনি গণভবন ছেড়েছিলেন। অবশ্য ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। আওয়ামী লীগ নেত্রী এবং নেতৃত্বের সমস্যা এখানেই। তারা সমর্থক চায়, পরামর্শক নয়। এ কারণেই সব সময় আওয়ামী লীগকে থাকতে হয়েছে ভুল তথ্যের ওপর ভরসা করে। ক্ষমতা ছাড়ার আগে একটি গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে ছিল আসন সংখ্যা কমে ৯০-এর মত হতে পারে। তখন চিন্তা করা হয়নি এত ভোটার ভোট দিতে যাবে। মহিলাদের এরকম উপস্থিতির বিষয়টিও ছিল হিসাবের বাইরে। চারদলীয় জোটের ভোট এক বাক্সে পড়লে হিসাব কেমন হবে তা নিয়ে ভাবেনি আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব। নির্বাচনের কয়েকদিন আগে শেখ হাসিনার প্রেস সেক্রেটারি জাওয়াদুল করিম জানিয়েছিলেন, বিএনপি'র জেতা আগের ১১৬ আসন বাদে অন্য আসনগুলোতে চারদলীয় জোটের ভোট অবিভক্তভাবে হিসাব করলে দেখা যায় জোটের আসন বাড়বে ৫০টির বেশি। তার এ কথায় শেখ হাসিনা গুরুত্ব দেননি। এভাবে যারাই আওয়ামী লীগ নেতৃত্বকে সঠিক তথ্য জানাতে গিয়েছেন তারাই তিরস্কৃত হয়ে দূরে সরে গেছেন।

দলীয় হাইকমান্ডের পাশে আসন সুসংহত করেছেন পোষ্যরা। তারা এখনও দলকে বিপথে নিচ্ছেন আন্দোলনে উৎসাহ দিয়ে। অগণতান্ত্রিক মনোভাব নিয়ে একজন লিখেছেন, এত কম আসন নিয়ে সংসদে গিয়ে কী লাভ। একজন লন্ডনে বসে দেখে ফেলেছেন সংখ্যালঘুরা এবার ভোট দিতে পারেনি। কেউ আবার বুদ্ধি দিয়েছেন কয়েকদিন পর সংসদ বয়কট করতে। এরা সবাই লিখেছেন আন্দোলনের ঘোষণায় শেখ হাসিনাকে অটল থাকার। এই পরামর্শানুযায়ী দলীয় নেতৃত্ব চললে দলের অবস্থান খারাপ ছাড়া ভালো হবে না।

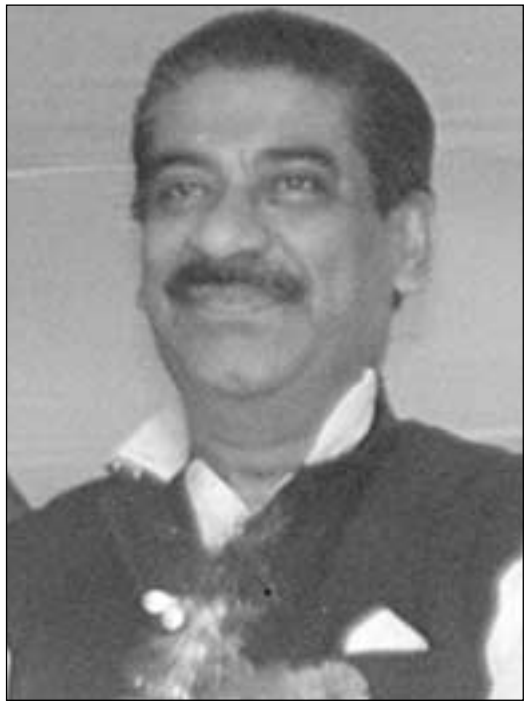

সাজেদা চৌধুরী ও হাসনাত আব্দুল্লাহর পরাজয় প্রমাণ করে শীর্ষ নেতারা জনবিচ্ছিন্ন ছিলেন

নির্বাচন-পূর্ব তথ্য বিভ্রান্তির রেশ এখনও আওয়ামী লীগের মধ্যে রয়ে গেছে। তারা হয়ত জানে না দলীয় সন্ত্রাস, দুর্নীতির এত অভিযোগের পরও ছিয়ানব্বইয়ের নির্বাচনের তুলনায় তাদের ভোট বেড়েছে। ২৮৩টি আসনের মধ্যে ১৫০টি আসনে আওয়ামী লীগের ভোট বৃদ্ধির পরেও পরাজিত হতে হয়েছে। ৪৬টি আসনে ভোট বেড়েছে এবং জিতেছে। অবশিষ্ট ৭২টি আসনে আওয়ামী লীগের ভোট কমেছে। ১৫টি আসনে ভোট কমার পরও আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা এসব আসনে জয়ী হয়েছেন। ২০০১ সালে আওয়ামী লীগের প্রাপ্ত ২৯৯টি আসনে (স্থগিত কেন্দ্রের ভোটার সংখ্যা বাদে) ২ কোটি ২৩ লাখ ২৬ হাজার ৫২২ যা প্রদত্ত ভোটের ৩৯.৯৪ ভাগ।

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভোট বেড়েছে ৬৪ লাখ ৪৩ হাজার ৭৩২ যা নতুন ভোটারদের ৩৪.৮১ শতাংশ।

'৯৬ সালের মোট ভোটার ছিল ৫ কোটি ৬৭ লাখ ১৬ হাজার ৭৩৫। ২০০১ সালের নির্বাচনে এ ভোট বেড়ে দাঁড়ায় ৭ কোটি ৫২ লাখ ২৬ হাজার ৭২২ অর্থাৎ ভোট বেড়েছে ১ কোটি ৮৫ লাখ ৯ হাজার ৯৮৭। অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা বিএনপি ও তার শরিকদের তুলনায় কম আসন পেলেও ভোটাররা আওয়ামী লীগের প্রতি বিমুখ ছিল না। যার প্রমাণ মেলে পরিসংখ্যানে। যেমন– ৬৪টি জেলার মধ্যে আওয়ামী লীগের ভোট বেড়েছে ৪৩টি জেলায়। এবং ভোট বৃদ্ধির গড় ৪.৯৮ শতাংশ।

এসব তথ্য বিভ্রান্তি থেকে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বকে মুক্ত হতে হবে। ভাবতে হবে তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রাজনীতি নিয়ে। নির্বাচনের ফলাফল দেখলে বোঝা যায় আসন কম পেলেও ভোটের সংখ্যার হিসাবে শঙ্কিত হবার মত পর্যায়ে এখনও পৌঁছেনি আওয়ামী লীগ। তবে ঠিকমত সময়ানুযায়ী রাজনীতি করতে ব্যর্থ হলে তা ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনবে।

দলের বিপর্যয় আটকাতে

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর আওয়ামী লীগ হাইকমান্ডের উচিত ছিল বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধানের। নেতা-কর্মীদের সঙ্গে আলোচনার উদ্যোগ নেয়ার প্রয়োজন ছিল। তাহলে নেতা-কর্মীদের মধ্যে এই বিশৃঙ্খলা দেখা দিত না। আর গণতন্ত্রের স্বার্থেই পরাজয়কে মেনে নিয়ে বর্তমান সরকারকে স্বাগত জানালে আন্তর্জাতিক কমিউনিটিতে আওয়ামী লীগের অবস্থান ভালো হতো। ব্যবসায়ী সমাজ ভালোভাবে নিত বিষয়টিকে। আর নেতাদের বুঝতে হবে রাজনীতি একদিনের ফল নয়। ইন্দিরা গান্ধী নিজ আসনে হেরে দলীয় বিপর্যয় মেনে জনগণের কাছে মাফ চেয়েছিলেন। পরে আবার নির্বাচিত হয়েছিলেন। জনগণ এই বিনীত চেহারা দেখতে ভালোবাসে। দাঙ্গা আর হুমকির রাজনীতি এখন কোনো মহলেই গ্রহণযোগ্য নয়। এমনিতেই আওয়ামী লীগের এ বিষয়ে 'খ্যাতি' আছে। তরুণ প্রজন্মের কাছে আওয়ামী লীগের গ্রহণযোগ্যতা কমে যেতে পারে এ ধরনের রাজনীতি অব্যাহত রাখলে। শেখ হাসিনাকে বুঝতে হবে জয় বিএনপি'র হয়নি। আওয়ামী লীগের পরাজয় খালেদা জিয়াকে বিজয় এনে দিয়েছে। আওয়ামী রাজনীতিতে সহনশীলতার অভাব– এই বদনাম ঘোচাতে হবে দলের শীর্ষ নেতাদের। শেখ হাসিনার বক্তব্য-বিবৃতিও সমালোচনার ঊর্ধ্বে নেই এখন। নির্বাচনের আগে দুই নেত্রীর বক্তব্যের তুলনায় এগিয়ে গিয়েছিলেন খালেদা জিয়া। বিভিন্ন জনসভার বক্তৃতায় শেখ হাসিনার অশ্লীল বক্তব্য নারী সমাজে ও নীরব ভোটারদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। যার ফলাফলে আওয়ামী লীগ হেরেছে নির্বাচনে। বিষয়গুলো

> একানব্বই-এ শেখ হাসিনা বলেছিলেন 'সূক্ষ্ম কারচুপি', ছিয়ানব্বইতে খালেদা জিয়া 'পুকুর চুরি' হয়েছে বলে অভিযোগ এনেছিলেন। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী এবার যোগ করেছেন নতুন বিশেষণ 'স্থূল কারচুপি'

নিয়ে আলোচনা হতে হবে আওয়ামী লীগের টেবিলেই। একানব্বই, ছিয়ানব্বই এবং এবারের নির্বাচনে ভোটের হিসাব বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিএনপি-জামায়াত জোট বাঁধলে তা আওয়ামী লীগকে কোণঠাসা করে রাখার জন্য যথেষ্ট। আওয়ামী লীগের দুর্গ হিসেবে পরিচিত রাজবাড়ী, সিলেটে তাদের বিজয় এ কথাই প্রমাণ করে। এই বিষয়টি বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী এবং অন্য শরিক দলগুলো বোঝে। তাই সরকার পরিচালনায় তারা এক পক্ষ অন্য পক্ষকে সাহায্য করবে এ নিয়ে সন্দেহ নেই। আর সংসদে যাবার আগেই আন্দোলন বা বয়কট করার সিদ্ধান্ত দেশের ঐতিহ্যবাহী গণতান্ত্রিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের কাছে কেউ আশা করছে না। কেননা পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকার সময়ে শেখ হাসিনা বার বার বলেছেন, 'সংসদই সকল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। ...আমি বিরোধী দলে গেলে হরতাল দেব ন । ।' তিনি এ বিষয়ে বিস্মৃত হলেও জনগণ মনে রেখেছে। আর নেত্রীর ওপর একবার আস্থা নষ্ট হয়ে গেলে তা ফিরিয়ে আনা কষ্ট হবে।

মোফাজ্জল হোসেন মায়া ও জিল্লুর রহমান দুজনকেই ভরাডুবির দায়িত্ব নিতে হবে

বাংলাদেশের মানুষ এখন সন্ত্রাস চায় না। চায় শান্তি। তারা জানে সরকার তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবে না। পারবে না আয়ের উন্নতি করতে। জনগণ নিজেই নিজের ব্যবস্থা করবে। শুধু চায় নির্বিঘ্নে কাজ করতে। সন্ত্রাসমুক্ত স্বাভাবিক জীবনযাপনের নিশ্চয়তা চায়। আওয়ামী লীগের সমস্যা হচ্ছে এই বিষয়টি আওয়ামী লীগ ধারণ করতে পারে না। নেতারা মনে করেন, রাজপথ দখলে রাখতে হবে। মিটিং-মিছিলে লোক সমাগম দেখাতে হবে। সব কিছু নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। এই চিন্তাভাবনা বর্তমান প্রজন্মের নয়। নয় নীরব ভোটারদেরও। আওয়ামী লীগে প্রবীণ নেতাদের সংখ্যা অত্যধিক হওয়ার জন্য সেখানে তরুণদের কথা বলার কেউ নেই। বললে তা বেয়াদবি হিসেবে ধরা হয়। এ কারণেই দলটি প্রতিনিয়ত অতীতমুখী হয়ে যাচ্ছে। নির্বাচনী প্রচারণায় কম মূল্যে কম্পিউটার বাজারে পাওয়া যাবার কৃতিত্বের কথা আওয়ামী লীগ নেতারা বলেননি। নির্বাচনের শুরুর দিকে কৃষিক্ষেত্রে সাফল্যের ওপর জোর দিলেও কয়েকদিন পরই অকারণে সন্ত্রাস ও দুর্নীতি নির্মূল করার অঙ্গীকারের ওপর বেশি বক্তব্য দেয়া হয়েছে। তাও শীর্ষ সন্ত্রাসীদের পাশে নিয়ে।

ক্ষমতায় থাকার পাঁচ বছর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়ে কোনো কথা বলেনি। ক্ষমতা ছেড়ে অপরাধীদের বিচারের দাবিতে গলাবাজি করেছেন আওয়ামী নেতারা, যা সাধারণ ভোটাররা স্বাভাবিকভাবে নেয়নি। সংখ্যালঘুরা বার বার আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছে কিন্তু আওয়ামী লীগ তাদের জন্য কিছুই করেনি। উল্টো আওয়ামী লীগ নেতারা সবচেয়ে বেশি সংখ্যালঘুদের বাড়ি দখল করেছে, নির্যাতন করেছে। এ কারণে সংখ্যালঘুরাও এবার আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়নি। তাই দেখা যায় পুরান ঢাকার সংখ্যালঘুরা ভোট দিয়েছে ধানের শীষে সাদেক হোসেন খোকাকে। নড়াইলের সংখ্যালঘুরা ভোট দেয়নি শেখ হাসিনাকেও। তাই তিনি ধীরেন্দ্রনাথ সাহার বিরুদ্ধে সামান্য ভোটে বিজয়ী হয়েছেন। আর পুরো নির্বাচনী পরিকল্পনায় বিএনপি'র তুলনায় আওয়ামী লীগ অনেক পিছিয়ে ছিল।

বিএনপি নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিল তারেক রহমানের মতো তরুণ নেতাকে। অসম্ভব যোগ্যতার সঙ্গে তিনি বিএনপি'র নির্বাচনী কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। আর আওয়ামী লীগ নির্বাচনী কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিলো গণবিচ্ছিন্ন আমলা মানসিকতার শাহ এএমএস কিবরিয়াকে। তার সঙ্গে ছিলেন মোজাফফর হোসেন পল্টুর মতো আরো কিছু ব্যর্থ নেতা। ফলে সারাদেশের সঙ্গে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী অফিসের কোনো সমন্বয় ছিলো না। কর্মীদের জন্য নির্বাচনী অফিস ছিলো প্রায় নিষিদ্ধ। বিষয়টি মানতে হবে দলের নেতা-নেত্রীদের। আত্মবিশ্লেষণ করতে হবে পরাজয়ের। নতুন কথা বলতে হবে নেতাদের। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে মুক্তিযুদ্ধ টেনে আনার পরিণাম যে ভালো হয় না তা এবার বোঝা গেছে। কিন্তু পোষ্য বুদ্ধিজীবী, অন্ধ সমর্থক-কর্মী, দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের তৈরি ধুম্রজালে এখনও আবদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব। তাই তারা অহেতুক আন্দোলনের কথা বলছে। এই জনসমর্থনহীন কর্মসূচি থেকে আওয়ামী লীগ বের হয়ে না এলে এবং ভবিষ্যতে সুস্থ রাজনৈতিক চর্চা করতে ব্যর্থ হলে দলটির বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। গণতন্ত্র মানলে জয় পরাজয় মানতে হবে।

> দোর্দন্ড প্রতাপশালী মোফাজ্জল হোসেন মায়া দুই দিন কর্মী-সমর্থকদের তোপের মুখে পড়েছেন। তাকে গালিগালাজ করতেও কেউ ছাড়েননি। সূত্রাপুরে জোড়া খুনের প্রধান আসামি সুমনের মা শেখ হাসিনার বান্ধবী মহিলা আওয়ামী লীগের ওয়ার্ড সভাপতি নজিবুন আহমেদ সভাস্থল ছাড়তে বাধ্য হন দলীয় লোকদের ক্ষোভের কারণে

দলের শীর্ষ নেতাদের মনে রাখতে হবে দলের থেকে দেশ বড়। তাই ব্যক্তিগত ও দলীয় সংকীর্ণতার বাইরে থেকে দেশের জন্যই তাদেরকে নেতিবাচক রাজনীতি ছাড়তে হবে। না হলে জনগণও তাদের ছাড়বে না। আজকে দলীয় কর্মী সমর্থকদের তোপের মুখে পড়ছেন নেতারা, কালকে দেশবাসীর তোপের মুখে পড়বেন তারা।